

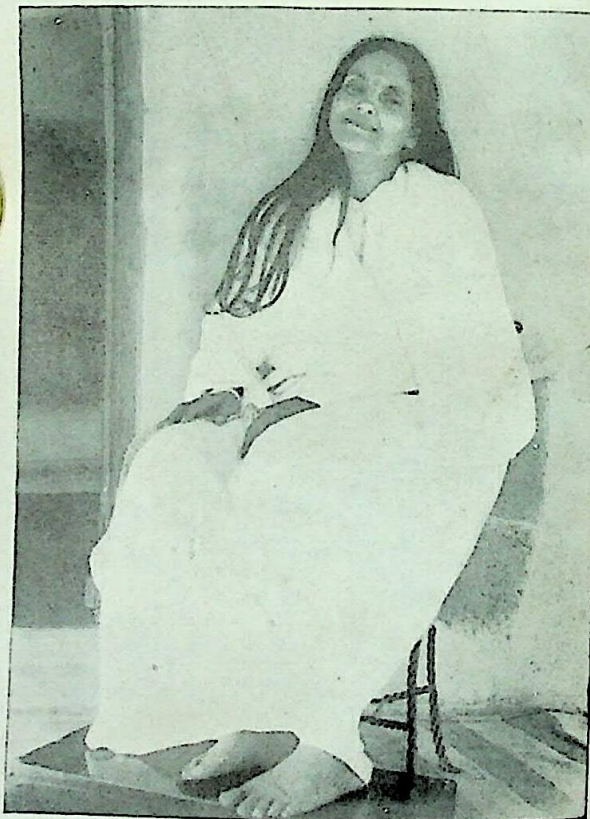
ब्रह्मसूत्र चर्चा



श्री श्री आनन्दमयी चरितेबल संसाइति

ब. लि. का. का.





কল্যাণ-বাণী

শিবানন্দ সংকলিত



শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি

কলিকাতা-৭০০০৬৯

প্রকাশন বিভাগ :

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি

৩১, এজরা ম্যানসন

১০নং গভর্নমেন্ট প্লেস ইষ্ট

কলিকাতা-৬৯

প্রথম প্রকাশ

১৩৯০ বঙ্গাব্দ

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য দুই টাকা মাত্র

মুদ্রক

শুভঙ্কর বসু

জে. জি. প্রিন্টার্স

কলিকাতা-৭০০০০৬

ক্রমিক বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
নিবেদন	(ক)
যাজ্ঞা	(গ)
ভক্ত সাধক শ্রীমোহনানন্দজীর মাতৃ সমীক্ষা	(ঘ)
শ্রীশ্রীমা	(ঙ-ট)
পঞ্চ মহান-বার্তা	১
প্রার্থনা ও প্রয়োগ	২
গুরু	৬
ভগবান	৯
নাম ও নামী	১১
ধর্ম কর্ম	১৩
সাধন ভজন	১৬
শান্তি লাভের উপায়	১৯
বিবিধ	২১
সাহসনা ও আশার বাণী—মাতৈঃ	২৩
মাতৃকৃত পরিভাষা	২৫

নিবেদন

প্রতিটি মাতৃবাণী এক বিরাট মধুচক্রে এক একটি প্রকোষ্ঠ। মধুচক্রে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ মধুপূর্ণ, প্রতিটি মাতৃবাণী অমৃতের আকর। পথ ভ্রষ্ট, ত্রিতাপ তপ্ত চতুর্বিধ অপবর্গেচ্ছু গৃহী সাধু-সন্ন্যাসী-যুবা, বৃদ্ধ-প্রৌঢ় প্রভৃতি অসংখ্য জনমানসে আকুল আকুতির নিবৃত্তি কল্পে মাতৃবাণী গুলির স্বতঃস্ফূরণ। ইহাতে আছে সর্বজনের সব জ্বালা ও সব ব্যাধির অমোঘ ঔষধ। ইহাদের যত অধিক পঠন-পাঠন, ততই জগতের কল্যাণের দিক্।

শ্রীশ্রী মায়ের বাণীগুলি যেমন অনবন্ত তেমনি সংখ্যায় ও অগণিত। সেই অগণিত সংখ্যক বাণী হইতে অতি যত্ন ও সাবধানতার সহিত নির্বাচন করিয়া এই বাণীগুলি সংকলিত হইয়াছে—যাহাতে সর্বস্তরের সর্ব ভাবের ও সর্বসাধন পথের পথচারীদিগের চলার পথ ইহা আলোকিত করিতে পারে।

এককথায় এই পুস্তিকা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস
এই আশ্রম চতুষ্টয়ের দিক্ প্রদর্শক।

সর্বাবস্থায় যিনি থাকিতেন সহজ সমাধিতে স্থিত, সর্বজনে
পরম সত্য ও চির শান্তির সন্ধান প্রদান উদ্দেশ্যে-ই ষাঁহার
প্রাকট্য সেই সত্য স্বরূপী ব্রহ্মস্বরূপিনী শ্রীশ্রীমায়ের বাণীর
সংসদ লাভে সকলের জীবন শান্তিময় আনন্দময় ও ধন্য
হউক ইহাই করুণাময়ী মায়ের শ্রীচরণে ঐকান্তিক
নিবেদন। ইতি—

মাতৃচরণাগত সংকলক

২৭শে আগষ্ট,

১৯৮৩ খৃঃ

(৭)

শাস্ত্র

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,

লইলু শরণ, লইলু শরণ ॥

অঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,

পরাও পরাও জ্যোতির টীকা—

করো হে আমার লজ্জা হরণ ॥

পরশ রতন তোমারি চরণ—

লইলু শরণ, লইলু শরণ ।

যা কিছু মলিন, যা কিছু কালো,

যা কিছু বিরূপ হোক তা ভালো—

ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(গ) ,

মাতৃ-সমীক্ষা

“ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে, ধারণায় যা আনিতে পারি, শ্রীশ্রীমা তাহার-ই মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার দেহ ও লীলা বিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ,—এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্মে ধ্যানে ও জ্ঞানে তিনি-ই একমাত্র পরম উপাস্ত, ইহা স্থির বুদ্ধিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে বসাইতে পারিলে পরমার্থ পথে অণু কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে না।

তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কোনো বাণী ব্যর্থ হইবার নয়, এবং তাঁহার স্মৃতি কালের অধীন নহে—ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য।”

—পরম ভক্ত সাধক শ্রীমোহনানন্দ পর্বত

(৪)

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আবির্ভাব ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশান্তর্গত)। ১৩০৩ সনের ১২শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার (ইং ৩০শে এপ্রিল, ১৮২৬ খৃঃ) রাত্রি প্রায় তিন দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বিছাকুট নিবাসী কাঞ্চপ গোত্রীয় ৮বিপিন বিহারী ভট্টাচার্যের ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুলতানপুর নিবাসী ৮রমাকান্ত ভট্টাচার্যের কন্যা বিধুমুখীর দ্বিতীয়া কন্যারূপে। নাম নিয়েছিলেন নির্মলাসুন্দরী। হাসি খুশীতে ভরা অপূর্ব দৈহিক ও স্বভাব সৌন্দর্যে ঘেরা এই ক্ষুদ্র মেয়েটিকে ঐ নামে ডেকে সবার তৃপ্তি হত না। তাই পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয় তাঁকে ডাকত আরো বিভিন্ন নামে। কেউ বলত খুশীর মা, কেউ আদরিণী, কেউ বা বলত নন্দিনী বা তীর্থবাসিনী বা বিমলা। অনেক পরে আর এক নাম হয়েছিল—মানুষ কালী। কিন্তু সব

শ্রীশ্রীমা

নামের সেরা নাম ভাইজী (শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায়) প্রদত্ত
‘আনন্দময়ী’ নামেই তিনি সর্বজন পরিচিতা হয়েছিলেন।
কারণ তিনি ছিলেন আনন্দ প্রতিমা।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সময় হতেই তাঁকে ঘিরে ফুটে
উঠত নানাপ্রকার অলৌকিক রহস্য। সন্তোজাত শিশু
প্রসূতি-গৃহের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের আমগাছ
দেখতেন। দেখতেন, বহু দেবদেবী যুক্ত করে শায়িত
শিশুকে প্রণতি জানিয়ে যাচ্ছেন। এই জাতীয় অনেক
কথাই পরবর্তীকালে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর
আবির্ভাবের একাদশ দিবসে শ্রীনন্দন চক্রবর্তী (বিধুমুখী
দেবীর দূর সম্পর্কীয় মাতুল) তাঁকে দেখতে এসেছিলেন
সেকথা বহুদিন পরে প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর জননীকে স্মরণ
করিয়ে দিয়েছিলেন।

মা আবির্ভূত হয়েছিলেন লীলা পুরুষোত্তম হয়ে।
কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি কুমারী বা গৃহস্থ বধুরূপে কিংবা

শ্রীশ্রীমা

ভক্তসঙ্গে তাঁর লীলা বৈচিত্র্যে বিশ্ববাসীরা আশ্চর্য চকিত হয়ে যেতেন। এর কারণ এই ছিল যে, মানুষ যা করে তার ভিত্তি থাকে অহংকারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মা দেহধারণ করেও তিনি ছিলেন দেহবোধ শূন্য। স্ব-স্বরূপে তিনি ছিলেন নিত্য জাগ্রত। স্বভাবের প্রেরণায়-ই তাঁর লীলাখেলা পরিচালিত হত। শৈশবে পাড়া-পড়শী, আত্মীয় স্বজনকে তিনি মাধুর্য লীলায় বিমোহিত করেছেন। কৈশোরের 'মা আমি বাঁকা হয়েছি' লীলা ভিন্নতর। গৃহস্থ বধূরূপে সেবা যত্নের লীলায় পরিবার-পরিজন ছিল মুগ্ধ।

অনতিকাল মধ্যেই তাঁর লীলা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ধারায় বইতে লাগল। এবার আরম্ভ তাঁর যোগসাধনের যোগিনী লীলা। এই লীলায় মায়ের দেহকে আশ্রয় করে শাস্ত্রোক্ত আবৃত্তীয় যোগ ও সাধন ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠতে লাগল। এ যেন অপার সমুদ্রের অগণিত লহরী একের

(ছ)

শ্রীশ্রীমা

পর এক মায়ের দেহের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলে যেতে লাগল।
মায়ের দীক্ষা হ'ল। সে এক বিচিত্র লীলা। নিজে-ই
গুরু নিজে-ই শিষ্য, নিজ মুখেই মন্ত্রোচ্চারণ নিজ কণ্ঠেই
শ্রবণ, গ্রহণ। এক শ্রাবণী পূর্ণিমাতে সর্বদেবদেবীময়ী
মায়ের দেহ হ'তেই আবির্ভূত হতে লাগলেন দেবদেবী
আবার মায়ের দেহে-ই ঘটল তাঁদের নিমিলন। সে লীলায়
বিশ্বয় ও বৈভবের পরাকাষ্ঠা।

নাম

ক্রমে মা নিজেকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ভক্তজনগণ
মধ্যে। জীবন মধ্যে আরম্ভ হ'ল আর এক অধ্যায়।
ইতিমধ্যে বার বৎসর দশ মাস বয়সে মায়ের বিবাহ। স্বামী
ঢাকা আটপাড়া নিবাসী শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী। সে
লীলাও কি কম বিশ্বয়কর! বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী
রমণীমোহন মাকে মা বলেই ডাকতেন এবং মা-ও তাঁকে
বাৎসল্য স্নেহে ভোলানাথ নামে-ই সম্বোধন করতেন।

(জ)

শ্রীশ্রীমা

তিনি মাতৃনির্দেশে জীবনের আত্মোপাস্তাই হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক পথের পথিক।

যাহোক্‌ মায়ের নবীন লীলায় ভোলানাথ তো ছিলেন-ই ক্রমে গুরুপ্রিয়া দিদি (আদরিণী দেবী) ও জ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী) আবির্ভূত হলেন মায়ের লীলাসঙ্গী হয়ে। প্রথমে বাজিতপুর, শাহাবাগ, ও ঢাকায় কিছুদিন চলল মায়ের ভাবসমাধি ও যোগ সমাধির লীলা। বিভিন্ন পরিবেশে তিনি পুনঃপুনঃ সমাধিস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। ক্রমে, তা রূপান্তরিত হ'ল সহজ-সমাধিতে। এই সময় হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া মায়ের শরীরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হ'তে লাগল। কখনো বাইবেলের সুরে বাইবেলের প্রার্থনা মন্ত্র কখনো স্প্রুঙ্গষ্ট উচ্চারণে কোরাণের মন্ত্রে নমাজ পাঠ, কখনো বা প্রাচীন কাঁসী ভাষায় জেন্দাবেস্তার মন্ত্র প্রস্ফুটিত হতে লাগল।

এর পরেই একদিন মা বিশ্বজনীন লীলায় অবতীর্ণ

(২)

শ্রীশ্রীমা

হলেন। মা অনুভব করলেন,—“বিশ্বের প্রতিটি লোক প্রতিটি প্রাণী, বৃক্ষ-লতা, কীটপতঙ্গ, ধূলি, মাটি, জল, এমন কি দেবতা-বিগ্রহ-ও” মাকে আকর্ষণ করছে। শুধু স্থলেই নয় স্থল্লেও সেই আকর্ষণ গ্রহ-গ্রহাস্তরে। সেই দুর্নিবার আকর্ষণেই মা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ভারতের আনাচে-কানাচে, গ্রামে গঞ্জে, সহরে বন্দরে দেশে-বিদেশে স্থলে-স্থল্লে ঘূর্ণি-বাত্যার মত-ই। এ লীলা চলেছে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরে। এই পরিভ্রমণের ফলে মার শরীরকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মন্দির, শত শত আশ্রম জাগ্রত হয়েছে অগণিত লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থলী, দেশ-বিদেশ প্রাণিত হয়ে গেছে ধর্মের প্রাবনে। মাতৃ-দর্শনে, মাতৃস্পর্শে, মাতৃ-উপদেশ ও বাণী শ্রবণ করে অগণিত নরনারী শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-কিশোর-কিশোরী, সাধু-সন্ন্যাসী নবজীবন লাভে ধন্য হয়েছে। মা ছিলেন দুঃস্থের বন্ধু, অগতির গতি, শোকার্তের সাহায্য, অসহায়ের সহায়, বিশ্বজনার করুণাকাতর

শ্রীশ্রীমা

জননী । মা বলতেন,—“যাদের কেউ নাই, তাদের-ই এ শরীরটার বিশেষ প্রয়োজন ।” মায়ের জীবন-লীলায় ইহা আক্ষরিক সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে ।

এইভাবে সুদীর্ঘ সাতাশি বৎসরকাল অতিবাহিত করে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট উত্তর প্রদেশের দেৱাছন সহরে বিশ্বজননী মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন । এর ঠিক কয়েকদিন পূর্বেই অগন্যুগুরু শংকরাচার্য মায়ের অসুস্থতার সংবাদে ব্যস্ত হয়ে মাতৃচরণে উপস্থিত হয়েছিলেন মায়ের আরো দীর্ঘ জীবন কামনা করে । মা তাঁর সেই প্রার্থনার উত্তরে বলেছিলেন,—“পিতাজী ! অপ্রকট্ । অপ্রকট্ খাঁচ রহা হয় ।” সেই অপ্রকটের আকর্ষণেই মা অপ্রকট হয়ে মা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়লেন । পরে শিবতীর্থ কনথলে গঙ্গাতটে তাঁকে স্থল সমাধিস্থ করা হয় ২৯শে আগষ্ট তারিখে । কিন্তু মা আজো বিদ্যমান, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোনো কোনো ভাগ্যবান আজো প্রায়ই পাচ্ছেন ।

(ট)

শপথ মহান বার্তা

- ১। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা ।
- ২। যতক্ষণ আমি ততক্ষণ তিনি নাই । আমার মৃত্যু তাঁর প্রকাশ ।
- ৩। অমর আত্মা অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি ।
- ৪। দল ছাড়লে সবই যোগ ।
- ৫। যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী ।

প্রার্থনা ও প্রয়োগ

প্রার্থনার শক্তি অসীম। প্রার্থনার জগতে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। প্রার্থনায় শক্তি লাভ হয়। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনার ফলে সবই লাভ সম্ভব।

*

*

*

শয্যা ত্যাগের সময় ভাববে—‘ঠাকুর তুমিই যন্ত্ররূপে বা ‘তোমার-ই যন্ত্র’ এই যন্ত্র দিয়ে যেন সারাদিন শুভকর্ম হয়। রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় প্রার্থনা করবে—‘সারাদিন যা করালে তোমার চরণে সব সমর্পণ। আর তন্ন তন্ন করে সারাদিনের কর্ম দেখা ; যদি ভুল থাকে, প্রার্থনা—‘ক্ষমা করো, আর যেন ভুল না হয় ; সব কর্মই যেন শুদ্ধ হয়। পরে নাম করা, প্রণাম করা, মনে মনে হলেও ধ্যান করে তাঁর পায়ে

প্রার্থনা ও প্রয়োগ

মাথা রাখা। অবশেষে আমার দেহ-মন তোমার পায়ে
সমর্পণ—এই ভেবে গুয়ে পড়া।

*

*

*

প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ। প্রার্থনায় জীব ও
জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা প্রাণে আসে, তাঁকে
জানাবে। আর সরল ও ব্যাকুল হয়ে তাঁর শরণাগতি
প্রার্থনা করবে।

*

*

*

মৃত্যুর মৃত্যু হওয়া চাই। মৃত্যুর ধ্যান আসে কেন?
এ যে অমৃত, মৃত্যু কোথায়? পাগল! বাঁকে পেনে অখণ্ড-
মণ্ডলাকার নিখুঁত প্রকাশ, সেই তো নিজেই পাওয়া।
পাওয়ার গোল সেতো ভাল।—কিন্তু গুণগোল নয়। এই
চিন্তাই কেন? দুর্বলতার আশ্রয় নিতে নাই। তিনি তো

কল্যাণ-বাণী

আছেন-ই। তাঁর কাছে প্রার্থনায় সমস্ত দুর্বলতা দূর হয়ে যায়।

*

*

*

অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। প্রত্যেক মুহূর্তের সফলতা প্রয়োজন। সত্যানুসন্ধানে লেগে যাও। সন্ত্যনাভ আকাঙ্ক্ষায় তাঁর কাছে প্রার্থনা কর—‘ঠাকুর, তুমি ছাড়া যে আমার দিনগুলি বৃথা চলে যাচ্ছে। আমাকে দয়া কর।’

*

*

*

প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করবে—‘হে অন্তর্ধামী দেবতা, প্রতি জীবের হৃদয়ে তোমার জগ্নে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তি ও অনুরাগ জাগিয়ে দাও।’ সংসারের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকারকে ডেকে বলিও ‘দেখ তোমাদের যে প্রভু, এখন তাঁর নিকট যাচ্ছি, আমাকে

কল্যাণ-বাণী

তোমরা পথ ছেড়ে দাও—এই বলে নিশ্চল হয়ে আসনে
বসবে, তারপর প্রার্থনা করবে—‘হে ভগবান, আমার মধ্যে
প্রকাশিত হও। আমাকে আপন করে নাও। আমায়
পথ দেখাও।

গুরু

গুরু কে ? জেনে রেখো, গুরু বলতে একমাত্র স্বয়ং একই । স্বয়ং ভগবান-ই গুরুরূপে প্রকাশ হ'ন । বিশ্বাস করো তাঁকে ডাকো ।

*

*

*

যদি একবার গুরু আশ্রয় দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শিষ্যের লক্ষ্য পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গুরু যান না । গুরু যান না, এ প্রশ্নও ওঠে না । গুরু যাবেন কোথায় ? তাঁর কি আসা যাওয়ার প্রশ্ন আছে ? কাজেই গুরু যেখানে, আসা যাওয়ার প্রশ্ন সেখানে নাই । কারণ সেখানে দেহ থাকতে পারে না ।

*

*

*

গুরু শক্তিতেই সব হয় । গুরু কর । আবার সর্বরূপ সর্বনামে তিনি-ই । একটি নিয়ে বসে যাও । আবার তাঁর

গুরু

নাম নাই রূপও নাই তিনি অনামী, নিরাকার। যতক্ষণ গুরু না মিলে, যে রূপ, যে নাম ভাল লাগে নিয়ে থাকা আর নিত্য প্রার্থনা,—“ঠাকুর, তুমি আমার নিকট সদগুরু রূপে প্রকাশিত হও। গুরু তো অন্তরে। হে অন্তর্যামী, প্রকাশিত হও।

প্রকৃত গুরু যিনি, সর্বক্ষণ হাত ধরে-ই আছেন, কেহ চিন্তায় রাখুক আর না রাখুক। আরে চিন্তাটা করায় কে? সেই পরম গুরু-ই তো সব। আর তিনি যাহা করেন, তাঁর কাছে পৌঁছাবে বলেই তো! তিনি যখন স্ত্রু ধরে টানেন, তখনই তাঁর চরণে মাথা ঝুঁকে পড়ে।

*

*

*

গুরু তত্ত্ব বড় গভীর। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখা। গুরু কখনো ত্যাগ হয় না। গুরু জন্মজন্মান্তরের তাই গুরুশক্তি আর গুরুভক্তি শিখিল হয় না কখনো।

কল্যাণ-বাণী

অনেকে হুঃখ করে—‘সদগুরু কাছে দীক্ষা নিলাম, কৈ কিছুই তো হলো না’। কাপড়ে একটু কালির দাগ লাগলে, তা তুলতে কত সময় লাগে, আর চিত্তের এত গাঢ় ময়লা কি ২৪ দিনেই উঠে যাবে? গুরুর উপদেশের ওপর অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে নির্ভার সঙ্গে উপাসনাদিতে মনোনিবেশ কর। ফল দেবেই দেবে—সব হবে, সব হবে।

*

*

*

চিহ্ন

নিজে শিষ্য হ’তে চেষ্টা কর। গুরু মিলবে। কৃপা পাওয়ার দিক খুলবে। করুণা ধারার সন্ধান মিলবে। প্রার্থী হলেই জিনিষ মিলবার সম্ভাবনা। প্রার্থী তো হও।

ভগবান

ভগবানকে জানা, আপনাকে জানা ; আপনাকে জানা,
ভগবানকে জানা ।

*

*

*

ফুলের মধ্যে যেমন বীজ আছে, খুললেই দেখা যায়,
আবার বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে। তেমনি তোমার মধ্যেও
ভগবান আছেন। সাধন করে খুলতে পারলে, মনের
আবরণটা নষ্ট করতে পারলে, সেই যে স্বয়ং প্রকাশ, তাঁকে
পাওয়া যায়। বীজের মধ্যে যেমন সমগ্র গাছটি, তেমনি
তোমার মধ্যেও তিনি পূর্ণভাবে বিরাজিত।

*

*

*

যেমন তোমার আঙ্গুল স্পর্শ করলেও তোমাকে স্পর্শ

কল্যাণ-বাণী

করা হয়। অথচ তুমি আঙ্গুল নও। তোমার কাপড়
ছুঁলেও তোমাকে ছোঁয়া হয়। অথচ তুমি কাপড় নও।
তোমার অংশ যেমন তুমি, আবার সমগ্রও তুমি, তেমনি এক
হয়েও ভগবান বহু, বহু হয়েও এক।

*

*

*

ভগবানের এক নাম চিন্তামণি। তিনি সকল কামনা
পূর্ণ করেন বলে জীব তাঁকে চিন্তা করলে ক্রমে ক্রমে তাঁর
চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা থাকে না।

নাম ও নামী

নাম, নামী আর তাঁর রূপ অভিন্ন, যেমন অগ্নি উত্তাপ আর তার দাহিকা শক্তি। সর্বরূপে স্বয়ংই তো। আবার নাম নিতে নিতে চৈতন্য জাগ্রত হয়, যেমন বীজ বপন করলে বৃক্ষের উৎপত্তি। তাই নাম নিয়ে থাকাই তাঁকে নিয়ে থাকা।

* * *

ভগবানের নাম হবে। আর পবিত্রতা আসবে না—এ কী হয়। যেখানে তাঁর নাম, সে স্থান পবিত্র ধাম। তোমরা বল না জপাং সিদ্ধি—ভগবান্নামে চির শুদ্ধি, সর্ব-সিদ্ধি।

* * *

সৎসঙ্গ, সৎকথা, সৎ পরিবেশ, যাই বল না কেন, নামের মধ্যেই তো সব। আবার সৎ-চিন্তন, সৎ-বিচারের

কল্যাণ-বাণী

রাস্তাও নামেই খোলে। তাই সত্য প্রকাশের অনুকূল
ক্রিয়া নাম।

*

*

*

শান্ত পরিবেশে, অন্তরমুখী হয়ে ভগবানকে ডাক, তাঁর
নাম নিয়ে থাক। অন্তরের ঠাকুর তো! তাঁকে ডাকলে,
তার নামে অন্তর আলোকিত হয়ে উঠবে।

তোমরা বল তো 'রসো বৈ সঃ'। তিনিই রস এই
রসের উৎস ভগবান্নামেই খোলে।

*

*

*

ভগবানের নাম করবে, আর তার ফল হবে না—এ
হতেই পারে না। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর নাম কর, তাঁকে
ডাক। এ হলে তিনি স্বয়ংই তার ক্রিয়া দেন। তোমার
যথাশক্তি তাঁর নামে মন-প্রাণ ঢেলে দাও বাকীটা তিনি পূর্ণ
কবে নেবেন। নেবেন।

ধর্ম-কর্ম

যে ক্রিয়াতে ভগবৎ ভাব উদ্দীপিত হয়, সেই কর্ম-ই কর্ম। আর সব অকর্ম। যে পথে ভগবৎ ভাব নেই, প্রেয় হলেও তা ত্যজ্য। প্রেয় আপাত মনোহর, পরিণামে বিষময় অমঙ্গল-অশান্তিকর-মৃত্যুর দিক্।

*

*

*

মাহুষ নামে পরিচিত। মনের হুঁস হওয়া চাই। কর্তব্য নয় কি, আছাড় পড়িলে,—আবার সেই মাটি ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। বার বার তো আর পড়িয়া যায় না।

*

*

*

চেতনা মানেই খোলা উন্মুক্ত ভাব। সেই চেতনা পেতে হ'লে খোলা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়।

কল্যাণ-বাণী

খোলা জায়গায়, খোলা বাতাসে, খোলা শরীরে থাকার
 চেষ্টা। দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় বা সমুদ্রের দিকে চেয়ে
 থাকলে জড় গ্রন্থি ভেদ সহজ হয়।

*

*

*

যা সকলেই চায় তা পাবার সহায়ক কর্মই ধর্ম। তাই
 স্বভাবের কর্ম। আর যা অশান্তি দুঃখ আনে তাই অভাবের
 কর্ম-অধর্ম।

মাতার পরিচয় যেমন স্নেহ মমতায়, পত্নীর পরিচয় যেমন
 প্রেম অনুরাগে, বন্ধুর পরিচয় যেমন প্রীতি ও আত্মীয়তায়,
 তেমনি ধার্মিকের পরিচয় ধর্মাচরণে।

*

*

*

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকূপ। মানব জন্ম সব জন্মের সেরা।

ধর্ম-কর্ম

মানুষের মনোরাজ্যে এমন সব গুপ্ত সম্পদ নিহিত আছে যা
জগতের আর কোথাও নাই। ডুবুরীর মত নিজের অন্তরের
গভীরতায় ডুবে অহর্নিশি সেই সব রত্ন উদ্ধারের চেষ্টা কর।
ইহাই পরম পুরুষার্থ, ইহাই পরম ধর্ম।

*

*

*

ধর্মের দিকে মন দিতেই হবে। ধর্মই তো প্রাণের প্রাণ,
আত্মা। সেই আত্মা কে? তাঁকে জানতেই হবে। না
জানা পর্যন্ত উপায় নাই। যতদিন না জানা ততদিন দুর্ভোগ
ঃ ভুগতেই হবে ॥

সাধন ভজন

স্বধন লাভের জন্য স্বভাবের যে কর্ম-চেষ্টা তারই নাম সাধন। কর্ম মাত্রই সাধনা, জীব মাত্রই সাধক। ভগবান জীবের স্বধন বলে তিনিই সাধনার বস্তু। এক লক্ষ্য সাধনার প্রাণ ; শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ধৈর্য ইহার শক্তি।

*

*

*

আর ভজন কাকে বলে? 'ভ' মানে ভগবান যে আপন জন তার উপলব্ধির প্রক্রিয়াই ভজন। ইহাও ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। তবে সদ্বৈচ্ছা আগরিভ হ'লে ভগবানই তা পূরণের জন্য কৃপা করেন।

*

*

*

সাধন পথে করণীয়—

সংক্রিয়া, সংসঙ্গ, সত্যাচরণ।

ধর্ম-কর্ম

মানুষের মনোরাজ্যে এমন সব গুপ্ত সম্পদ নিহিত আছে যা
জগতের আর কোথাও নাই। ডুবুরীর মত নিজের অন্তরের
গভীরতায় ডুবে অহর্নিশি সেই সব রত্ন উদ্ধারের চেষ্টা কর।
ইহাই পরম পুরুষার্থ, ইহাই পরম ধর্ম।

*

*

*

ধর্মের দিকে মন দিতেই হবে। ধর্মই তো প্রাণের প্রাণ,
আত্মা। সেই আত্মা কে? তাঁকে জানতেই হবে। না
জানা পর্যন্ত উপায় নাই। যতদিন না জানা ততদিন দুর্ভোগ
হুগতেই হবে ॥

সাধন ভজন

স্বধন লাভের জন্ত স্বভাবের যে কর্ম-চেষ্টা তারই নাম সাধন। কর্ম মাত্রই সাধনা, জীব মাত্রই সাধক। ভগবান জীবের স্বধন বলে তিনিই সাধনার বস্তু। এক লক্ষ্য সাধনার প্রাণ; শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ধৈর্য ইহার শক্তি।

*

*

*

আর ভজন কাকে বলে? 'ভ' মানে ভগবান যে আপন জন তার উপলব্ধির প্রকিয়াই ভজন। ইহাও ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। তবে সদ্বৈচ্ছা জাগরিত হ'লে ভগবানই তা পূরণের জন্ত কৃপা করেন।

*

*

*

সাধন পথে করণীয়—

সংক্রিয়া, সংসঙ্গ, সত্যাচরণ।

সাধন ভজন

জন জনার্দনের সেবা তৎ জ্ঞানেতেই করবে ।

জপ, ধ্যান, পূজা, স্মরণ, কীর্তন আর ক্রিয়াযোগ
এবং তাঁর শরণাগতি—যুটিয়ে দেবে ভবরোগ ।

*

*

ভাল লাগুক আর না লাগুক, তাঁকে নিয়ে থাকতেই
হবে । ঔষধ খাওয়ার মত গিলতেই হবে । তাঁকে ভাল
না লাগলে যে চলবেই না । এরই নাম তপস্যা । এরই
নাম সাধনা ।

*

*

*

সাধন ভজন কী করতে হয়? সাধন-ভজনে গুরুর উপদেশ
যার যেভাবে থাকে সন্ধ্যা, সকাল, দুপুর, মধ্যরাত্রি, গুরুর
ধারা ধরে একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে - এই আসনে বসব,
এই জপ করব—এরূপ সংকল্প করতে হয় । ক্রমশঃ সময় ও

কল্যাণ-বাণী

সংখ্যা বাড়াতে হয়। নিয়ম করে নিতে হয়, অমুক তিথি বা অমুক বারে এতটা বাড়াব। এই ভাবে চলতে চলতে দেখবে তিনিই তোমাকে পরিবর্তিত করে নিচ্ছেন।

*

*

*

একান্ত না হলে শ্রীকান্তকে পাওয়া যায় না। নীরব ও নির্লিপ্তভাবে যারা পরম পুরুষের সাধনা করতে চায় হিমালয় তাদের পক্ষে বড়ই অনুকূল। ভাবকে লক্ষ্য করে যার সাধনা, সমুদ্র তীর তার উপযোগী। তরঙ্গে তরঙ্গে ভাবের হিল্লোল এসে ভাবময়ের সীমাতিত ভাবে তাকে ডুবিয়ে স্থিরলক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যার মন মাত্র সাধন পথের পথিক হবার জন্যে উন্মুখ হয়েছে, কোন নিভৃত রমণীয় স্থান তার পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণ গৃহধর্মীর পক্ষে ঈশ্বর চিন্তার জন্য অস্তিত্বঃ ঘরের কোণায় একটি নির্দিষ্ট শুদ্ধ স্থান করা আবশ্যক।

শান্তি লাভের উপায়

সকলেই শান্তি খুঁজে বেড়ায়। কেউ খোঁজে পুত্রে, কেউ ধনে, কেউ সাংসারিক ভোগে। কিন্তু প্রকৃত শান্তি সৎ কর্মের দ্বারা চিত্তের মনিনতা বিদূরিত হলে, হৃদয়ে ঈশ্বরের মনোমোহন রূপ ফুটে ওঠায়।

*

*

*

সব বিষয়ে ভগবানের ওপর নির্ভর। সব আবেদন নিবেদন তাঁকেই জানান। ভগবানের পেছনে ঘুরতেই হবে, এ ছাড়া উপায় নাই, অমৃতের সন্তান, তিনি মৃত্যুর দিকে যেতে দেবেন কেন ?

*

*

*

অশান্ত হলে পরেই সুশান্তকে পাওয়া যায়। শান্তি পেতে

কল্যাণ-বাণী

হলে তাঁর জন্মে ব্যাকুল হও। তিনি তো হাত বাড়িয়েই
আছেন।

*

*

*

বিপদ মানুষের ওপরেই আসে। কখনো নিরাশার
ভয়ঙ্কর কালো-মেঘ সর্ব দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। কিন্তু চিন্তা
কি? ভগবান তো আছেনই। তাঁর স্মরণে সব কালো
মেঘ কেটে যায়।

*

*

*

তুমি যদি শান্ত ও সমর্পিত হয়ে মাকে ডাক, অশান্তির
ছায়াও তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

বিবিধ

নিত্য ধ্যানের প্রক্রিয়া—নির্দিষ্ট সময় শুরু আসনে নিশ্চল হয়ে বসে মূর্তির ধ্যান কর। পরে মূর্তিকে আসনে বসিয়ে জপ করবে। তারপর প্রণাম করে ঠাকুরকে হৃদয়ে পুনঃ স্থাপিত করে উঠে যাও। এ ধ্যানের প্রক্রিয়াতে আত্মসমর্পণ হয়ে যাবে।

*

*

*

বাক্ সংঘম কি মোঁন ? মোঁনের সহায়ক। বাক্ সংঘমে মনের ক্রিয়া বর্তমান থাকে। আর মোঁন ? মোঁন মানে ভগবানে মনঃ সংযোগ। মোঁন হলে যাবতীয় প্রয়োজন স্বতঃই সিদ্ধ হতে থাকে।

*

*

*

কৃপা তো অহৈতুকী নিশ্চয়ই। পিতার সেবা করলে, পিতা প্রসন্ন হয়ে তোমাকে কিছু দিলেন— এ হ'ল কর্মফল।

কল্যাণ-বাণী

করলে, পেনে—কু, পা। কিন্তু পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ তো
 নিত্য। পরম পিতা, পরম মাতা তো তিনিই স্মৃতরাং
 হেতুর প্রপ্ন কোথায় !

*

*

*

বৈষ্ণব আর শাক্ত ? বৈষ্ণব কাকে বলে ? যার নিকট
 সর্বত্র বিষ্ণুরই প্রকাশ। আর শাক্ত ? যে কেবল মাকে
 দেখেন। কিন্তু সব ভাবের ক্ষুরণ, উৎস সে তো একই
 স্থানে। কার নিন্দা, কার স্তুতি ?

*

*

*

ক্ষণের অর্থ সময়। সময়ে কথা পড়লে তা ফলবতী
 হবেই। কিন্তু সে সময় তোমাদের ঘড়ির সময় না। সময়
 অর্থ স্ব+ময়। যেখানে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

সান্ত্বনা ও আশার বানী—মোটভাঙ

ভয় নাই। আমি তো তোদের সঙ্গে সदैই আছি।
ভয় কি!

*

*

*

তোরা যতদূর যেখানেই থাকিস এ শরীরের একটা লক্ষ্য
সর্বদা তোদের ওপর জেগে রয়েছে, জানিস্।

*

*

*

পাপ পুণ্য? পাপী পুণ্যাত্মা?—যেমন নদীর স্রোত
বিষ্ঠা ও চন্দন সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বাতাস দুর্গন্ধ, সুগন্ধ
কি বিচার করে? চন্দ্র-সূর্য সর্বত্রই আলো দেয়—এ শরীরের
নিকটও সেই কথা।

কল্যাণ-বাণী

তোদের একটা কথা বলিতেছি—এ শরীরের কাছে দূর নিকটের কোন পার্থক্য নাই। জানা-অজানা বলিয়া কিছু নাই। যে ঠাকুরের কাছে যে যার অন্তরের নিবেদন এ শরীরের কাছেই সব।

এই শরীরের কাছে, যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই ; এমন কি যারা মনে করেছে তাদেরও।

এ শরীরের একমাত্র কথা এই যে সকলে প্রতিদিন নিজ নিজ নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ নিজ উপাসনার অনুষ্ঠান করুক। ইহা সত্ত্বেও যদি ফল লাভ না হয়, তার জন্তে এ শরীর দায়ী।

মাতৃকৃত পরিভাষা

কৃপা—কৃ (করা)+পা (পাওয়া)=করলেই পাওয়া
যাবে।

সাধন—সা (স্ব)+ধন—স্ব (আত্ম)+ধন (পরম
সম্পদ, ঈশ্বর)=নিজ পরম সম্পদ (ঈশ্বর)
প্রাপ্তির প্রক্রিয়া।

ভজন—ভ (ভগবান)+জন (আপন জন)=ভগবান
নিজ জন তার উপলব্ধির প্রক্রিয়া।

সংসারী—সং (সঙ্)+সারী (সার মনে করেন
যাহারা)=প্রকৃত সত্যকে ভুলিয়া সঙ্কেই
সার মনে করেন যাহারা।

তপস্য়া—তপঃ (তাপ)+স্যা (সহ করা)=ঈশ্বর
লাভের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করা।

কল্যাণ-বাণী

বিশ্বাস—বিশ্ব (সমগ্র জগৎ)+আশ (আশা করা)
—সমগ্র জগতে সর্বরূপে যিনি তাঁকে পাওয়ার
আশা ।

বিষয়—বিষ (গরল)+হয়—পরিণামে বিষবৎ কাজ
করে যাহা ।

আশ্রম—আ (অ)+শ্রম ।—অ (অল্প বা বিনা)+শ্রম
অল্পায়াসে বা বিনা পরিশ্রমে ঈশ্বর লাভ
যেখানে ।

ব্যারাম—ব্যা (বে)+রাম—রাম নাই যেখানে—
ঈশ্বরের নাম, জপ প্রভৃতির অভাব অবস্থা ।

ছনিয়া—ছ (ছই)+নিয়া—সর্বরূপে এক তিনিই এ
বোধ নাই যেখানে ।

মাতৃকৃত-পরিভাষা

অগত—অ (যাহা) + গত (গত হয়) যাহা)—যাহা
স্থির নহে, অনবরত গতির মধ্যে—অনবরত
পরিবর্তনশীল ।

দেহ—দে (দাও) + হ—জন্ম জন্মান্তরের কামনাবাসনা
পুরণের আকাঙ্ক্ষার জন্ত শরীর ধারণ ।

নাশ—না = শ + (স)—তিনি (স) + না—তাহার
স্বরূপ না থাকায় তাহাই বিনষ্ট (বা পরিবর্তিত)
হয় ।

